Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 192-202

সাহিত্য সৃষ্টিতে ফর্মের বিবর্তন—
প্রসঙ্গ অমিয়ভূষণের 'মহিষকুড়ার উপকথা'

অভিজিৎ দাশ

'গল্প' ও 'উপন্যাস' সাহিত্যের দুটি অনবদ্য সৃষ্টি। অনেক সাহিত্যিক নিজেদের রচনা এক বা একাধিকবার পরিবর্তন করেছেন। এমনকি ফর্মও পরিবর্তন করেছেন। গল্পকে উপন্‌্যাস, কবিতাকে গল্প, গল্পকে নাটক ইত্‌্যাদিতে রূপান্তর সাহিত্যিকরা অনেকেই করে থাকেন। এরকম নজির বিশ্বসাহিত্যে বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার সৃষ্টির পরিবর্তন করেছেন। অন্য কোনো লেখকের এই রকম পরিবর্তনে যোগ দেওয়ার ঘটনা স্বাভাবিক ব্যাপার।

বাংলা কথাসাহিত্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার একটি মাইলফলক স্বরূপ। তিনি আজীবন লিটল ম্যাগাজিনে লিখে গেছেন। তার সাহিত্যের, সাহিত্যপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় পেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাগুলি তার লেখা ছাপানোর জন্য ছুটে এসেছে, তিনি নন। অমিয়ভূষণ মজুমদারের মধ্যেও লেখার ফর্ম পরিবর্তন করার প্রবণতা দেখা গেছে। তিনি তার বিখ্যাত উপন্যাস 'মহিষকুড়ার উপকথা'র মূল কাঠামো একটি গল্প হিসেবে রচনা করেছিলেন। গল্পটির নাম 'একটি খামারের গল্প'। গল্পটি **১৩৬৯** বঙ্গাব্দে (**১৯৬২** খ্রিস্টাব্দে) 'শারদীয় গণবার্তা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পের উপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসটি **১৯৭৯** খ্রিস্টাব্দে (**১৩৮৬** বঙ্গাব্দে) 'পরিচয়' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তখন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ একে 'বড়ো গল্প' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার লেখক স্বয়ং একে 'নভেলেট' হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। গল্প থেকে উপন্যাসে উত্তরণের সম্বন্ধে 'মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প' গ্রন্থটিতে 'নতুন সংস্করণ প্রসঙ্গে' অংশে লেখা হয়েছে, "যেন দীর্ঘকালের ব্যবধানে কোনো ছোটো ক্যানভাসের ধুলো উড়িয়ে পুরনো স্কেচের উপরে এখানে-ওখানে তুলির টানটোন, কিছু রাবারে ঘষে তোলা, কিছু নতুন রঙ আর তাতেই একটা নতুন ছবি আবার।"[১]

বর্তমানে 'গল্প' আর 'উপন্যাস'কে এক করে দেখার প্রবণতা বাড়ছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলো তো বটেই লিটিল ম্যাগাজিনও (কিছু কিছু) পিছিয়ে নেই। কিন্তু

....

বিশিষ্ট প্রবন্ধিক ও লোকসংস্কৃতিবিদ।

'গল্প' আর 'উপন্যাস' কি এক? সম্প্রতি একটি বহুল প্রচারিত বাণিজ্যিক পত্রিকার উপন্যাস সংকলনে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্পকে উপন্যাস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গল্পটিকে 'গল্প' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

উপন্যাস সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাস্তব জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত হইয়া, ঘটনার ধারাবাহিকতা ও শিল্পীমনের সচেতন উদ্দেশ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, এক সম্পূর্ণ, অন্ত:সংগতি বিশিষ্ট কাল্পনিক চিত্রে সংগত হয়। ইহাই সজ্ঞান উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর।"[২]

ইংরেজি 'Novel' বা 'Fiction' শব্দটি বাংলায় 'উপন্যাস' অর্থে ব্যবহৃত হয়। Webster's Comprehensive Dictionary, International edition-এ বলা হয়েছে, "A fictional prose narrative of considerable length, representing characters and events as if in real life by a plot or scheme of action of greater or less complexity" এজন্য ডক্টর প্রদ্‌যোত ঘোষ বলেছেন, "উপন্যাস হচ্ছে--

১/ দীর্ঘ আয়তন বিশিষ্ট বর্ণনাত্মক গদ্য রচনা।
২/ বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রসমূহযুক্ত।
৩/ কাহিনী বা বৃত্ত সমন্বিত।
৪/ কম-বেশি জটিলতাপূর্ণ ক্রিয়াশীল পরিকল্প।"[৩]

'উপন্যাস' সম্বন্ধে কবি ও লেখক শুদ্ধসত্ত্ব বসু বলেন, "উপন্যাসের কারবার হচ্ছে মানুষের জীবনকে নিয়ে, জীবনের বিভিন্ন দিক (aspect) নিয়ে, বোধ নিয়ে-- সবকিছু মিলিয়েই তার জীবনচিন্তা লেখক যে জীবন দেখেন, যে পটভূমি তার পরিচিত, সেই পটভূমিতে তার দেখা জীবনকে উপস্থিত করেন নচেৎ তা উৎকট রচনা হয়ে যেতে পারে। লেখক যা দেখেন-- তাকে বৃত্তাকার দান করেন-- অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বা টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে একটা নিটোল কাহিনিকে দাঁড় করান-- এই কাজে তার নিজস্ব চিন্তা বা প্রজ্ঞাজনিত দিব্‌যদৃষ্টি (vision)-- সবসময় তাকে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে থাকে, যার লেখায় এই vision নেই, তাকে খুব বড়ো উপন্যাস-শিল্পী বলা যায় না।"[৪]

গল্পও বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করে রচিত হয়। আবার কল্পনাকে আশ্রয়

করেও গল্প রচিত হয়। সেই কল্পনার মাধ্যমে হয়তো শিক্ষা দেওয়ার প্রবণতা থাকে, কোথাও বা মজা বা হাস্যরস পরিবেশন করা হয়। কোনো একটি ঘটনা বা একাধিক ঘটনার সমন্বিত বর্ণনাকে গল্প বলা হয়। গল্পের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ 'ছোটোগল্প'। আকারে ছোটো হলেই গল্পকে 'ছোটগল্প' বলা যায় না। তবে ছোটোগল্প ঠিক কি সে সম্বন্ধে একটি মাত্র সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। হাডসনের মতে, "A short story is, or should be a simple thing, it aims at producing once single vivid effect." আবার ব্যান্ডার ম্যাথুজের মতে,"A short story deals with a single event, a single emotion or the series of emotions called forth by a single situation." নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন, "ছোটোগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত, একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনি, যার একতম কর্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"

বিশ্বকবির 'বর্ষাযাপন' কবিতার কয়েকটি পংক্তি ছোটোগল্পের সংজ্ঞা হিসেবে হাজির করা হয়।

"ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা. ছোটো ছোটো দুঃখ কথা।
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি. প্রত্যহ যেতেছে ভাসি।
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা. ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে।
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

ছোটোগল্পের সূচনা ও সমাপ্তি হঠাৎ করেই হয়। মূলত একটি মূল ভাব বা ভাবনা ছোটোগল্পের বিশেষত্ব।

ছোটোগল্পের সৃষ্টি উনিশ শতকের ঘটনা। আর মানুষের মধ্যে গল্প কবে সৃষ্টি হল তার উত্তর দেওয়া মুশকিল। তবে ছোটোগল্পকে মনে রেখেই বোধহয় 'বড়ো গল্প' কথাটি এসেছে। বড়ো গল্পের পরিসর বড়ো। এতে বর্ণনার অবকাশ অনেক বেশি। বড়ো গল্প শাখা সমন্বিত হতে পারে। তবে এর প্রবাহপথ কোথায় যেন একমুখী। অর্থাৎ বড়ো গল্পের শাখাগুলির মধ্যে প্রথম থেকেই একটি সমন্বয়ের ছোঁয়া আছে। শাখা নদী মূল নদীর গর্ভ থেকেই সৃষ্টি হয়। তবে শাখা নদী মূল নদীর সাথে আবার মিলিত হতে

পারে, নাও পারে। বড়ো গল্পের শেষে কিন্তু সমন্বয় দেখা যায়। উপন্যাসের শাখাগুলি উপনদীর মতো। উৎস আলাদা হলেও উপনদী মূল নদীতে লীন হয়ে যায়। তাই উপন্যাস ও বড়ো গল্প এক হতে পারে না।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের জন্মস্থান কোচবিহার। সেখানে বসে বা চাকরিসূত্রে আশপাশে যেখানে তার জীবনের মূল্যবান সময় প্রায় নিঃসঙ্গ কেটেছে সেখানে নিঃসঙ্গতা কাটাতে তিনি কলম ধরেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "সাহিত্যসৃষ্টি শুরু হয় বি.এ. পড়তে পড়তে, ameturish ও ইংরেজিতে লেখা চলত। প্রকৃত সৃষ্টির চেষ্টা করি কুচবিহারের বাইরে চাকরি করতে গিয়ে... চাকরি করতে গিয়ে আমার অতি রূপবতী নগরী, আমার ভালোবাসার মানুষগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে, আমার প্রিয় কবি ও সাহিত্যিকদের সংস্রব হারিয়ে, এমন এক জগতে গেলাম যেখানে আমার দমবন্ধ হয়ে আসত, নিজেকে স্বর্গচ্্যুত মনে হত। সেই ভয়ঙ্কর depression থেকে বাঁচার চেষ্টাতেই, নিজের চারিদিকে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতেই সাহিত্য সৃষ্টির পথে চলা। আমি তো তখন নিঃসঙ্গ condemned সেলেই প্রায়, কে আর অনুপ্রেরণা দেয় সেখানে?"[৫] তার কথা থেকে বোঝা যায় নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচতেই তার সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই তা কেবল নিঃসঙ্গতায় থেমে থাকেনি। তাই আমরাও একজন প্রকৃত কথাশিল্পীকে পেয়েছি। তার উপন্যাস সৃষ্টির মূলে আছে ট্রমা। "ছোটোবেলায় বারবার অসুস্থ হওয়া, পড়াশুনায় বাধা পাওয়া, ঝড়ের রাতে স্টিমারে থেকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই চালানো, দাঙ্গা দেশভাগের নানা ঢেউয়ে অবগাহন করা, পোস্ট অফিসের চাকরি নিয়ে নির্বাসন জীবন কাটানো, পাঁচ ছয় বছরের বোন ও আড়াই বছরের মেয়ের মৃত্যুর মতো বহু ঘটনা অমিয়ভূষণের জীবন জুড়ে গভীরতর সব ট্রমার সৃষ্টি করেছিল।"[৬] তার নিজের কথায়, "এইসব অহেতুক মৃত্যুযন্ত্রণা, এইসব প্রতিকারহীন আরোপিত চাপিয়ে দেয়া ব্যর্থতা ট্রমার সৃষ্টি করে। এই ট্রমার উৎপত্তি থেকে পালাতেই হয়।"[৭] আরো বলেছেন, "ট্রমা থেকে আত্মরক্ষা করতে পলায়ন চেষ্টাই শিল্প সৃষ্টির মূলে। মর্ত্্যে পীড়িত মানুষ যেমন ধ্যানে দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করে,.. অধিদেবতাও তেমন ট্রমাকে আড়ালে ফেলে দিতে দিবাস্বপ্ন নির্মাণ করে যার নাম উপন্যাস।"[৮]

অমিয়ভূষণের গল্প নিছক রোমান্টিকতায় ভরপুর নয়। তার গল্প, "জীবনের স্বাদ দেয়, যে জীবন বহতা-- যার সঙ্গে মাটির গঙ্গার যোগ আছে।"[৯] তা তার এই 'একটি খামারের গল্প'তেও সুস্পষ্ট। 'একটি খামারের গল্প' জটিলতার ভার থেকে মুক্ত। এর ভাষা খুবই সহজ, সরল। গল্পের প্রধান চরিত্র আসফাক। সে কাজ করে একটি খামারে। খামারটি ধনী জাফরুল্লা ব্যাপারির। এর অন্যান্য চরিত্রগুলিরও মাটির কাছা-

কাছি বাস। সাত্তার, ছমির, নসীর প্রমুখ খামারের কর্মীরা তো চাষবাস নিয়ে কাটায়। আর খামার মালিক জাফরুল্লা ব্যাপারির ধনী জমিদার সদৃশ হলেও মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন নন। তার চার বিবির অবশ্য অন্দরমহলে বাস। চতুর্থ বিবি কমরুণ আসফাকের আবিষ্কার। আসফাক তাকে বনের মধ্যে এক বেদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া অবস্থায় পায়। সে তার প্রেমিকা হয়ে ওঠে। অবশ্য নিঃসন্তান ব্যাপারির বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে করতে কমরুণ তার চতুর্থ 'ঘরবালি' হয়ে ওঠে।

গল্পটির মূলকেন্দ্র জাফরুল্লার খামার। গল্পের শুরু সেই খামারে এক সকাল হওয়ার সময়ে। সেখানকার কর্মী আসফাকের ঘুম ভেঙে গেছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ে। তার রাতের আশ্রয় একটি চালাঘর। সেখানে ছয় জোড়া বলদের সাথে আছে একটি মাচা। সেই মাচায় একমাত্র মানুষ আসফাকের আশ্রয়। তার সাত বছরের আশ্রয়স্থলে তার প্রতিদিনকার অভ্যাস মতো ঘুম থেকে ওঠার অভিনয় করতে গিয়ে সেই ভোরে তার দ্বিধা হচ্ছিল, মনের মধ্যে একটা ভয়ও কাজ করছিল। "এগোবে, না পিছোবে ভাবছে সে, এমন সময় একজন বেরিয়ে এল অন্দরের দিক থেকে। হাতে পাটকাঠির মশাল।" তার এই ভয় ভয় ভাব, দ্বিধা ইত্যাদি হওয়ার কারণ হিসেবে আসফাক তার মনিবের বাড়িতে এসে ক্যাম্প করা হাকিমবাবুকে মনিবের নামে করা অভিযোগকেই দায়ী করেছে। সে যে মনিবের কাছ থেকে মজুরি পায় না তা হাকিমকে বলে দিয়েছিল। হাকিমও নিশ্চয়ই তা ব্‌যাপারিকে জানিয়েছেন। তারপরই জাফরুল্লার ছেলে মুন্নাফ তার কাছে এসে তাকে জাফরুল্লার জন্য ওষুধ আনতে সলসলাবাড়ি (আলিপুরদুয়ার জেলায় অবস্থিত) পাঠায়। আসফাক রওনা দেয়। সে ইচ্ছে করেই ওষুধ আনতে দেরি করে। পরে শেষ রাতে খামারে ফিরে আসে। তার এই ফিরে আসা ছমির দেখে ফেলেছে। এই জন্য তার ভয় ভয় ভাব, দ্বিধা একসঙ্গে কাজ করেছিল। এটা তার বোকামি বলেই মনে হয়েছে। এরকম বোকামি সে আগেও করেছে।

তখন বাবা, মা ও ছেলেকে নিয়ে ছিল তাদের সংসার। বুধাই রায়ের ছয় বিঘা জমির আধিয়ার ছিল তার বাবা। মনিবের ঘরেই তাদের বাস ছিল। মা ও বাবার মৃত্যু হয় স্বল্প ব্যবধানে। বুধাই রায় নতুন আধিয়ার নিয়ে আসেন। আধিয়ার আসার দিন সে ঐ ঘরে লুকিয়েছিল। তাই আধিয়ার ঐ বাড়ির দখল নিতে এসে তাকে খুঁজে পায়নি। আধিয়ার তো আদালতের পেয়াদা বা পুলিশ নয়। অথচ আসফাক বোকার মতো লুকিয়ে ভয়ে কাঁপছিল।

সেবারের মতো এবারেও কোনো ঘটনা ঘটল না। কিন্তু আসফাক নিজের দেরিতে আসার কারণ হিসেবে 'ভুলুয়া লাগা'র মতো অলৌকিক কাহিনি অন্্য মজুরদের মধ্যে প্রচার করল। সেই কথা বাড়ির অন্দরমহলেও পৌঁছাল। সেসময় বাড়িতে জাফরুল্লা ও মুন্নাফ ছিল না। তারা শহরে গিয়েছিল। যাই হোক তার প্রতিদিনের কাজ করতে শুরু করল সে।

এর আগে জাফরুল্লাকে একবার পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে আট দশজন আধিয়ার-চাকরকে পুলিশে ধরেছিল। তখন বাড়ি ও খামারের দেখাশুনার পূর্ণ দায়িত্ব আসফাককে দিয়েছিল মনিব। সেই পনেরো দিন "আসফাক কি না করেছে!" অথচ মনিব এলে তখন কেউ আর তার খোঁজ নেয়নি। এদিনও একই রকম দায়িত্ব বর্তাল তার উপর।

সন্ধের সময় মনিবের বাড়িতে খেতে গেল আসফাক। সেখানে বড়ো বিবি তার পথ হারানোর কারণ জানতে চাইল। আসফাক পথ হারানোর ঘটনায় সম্মতি জানাল। ছোটো বিবি তাকে পরি ধরেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে মুখ নামিয়ে নিল। এখানে ছোটো বিবি হলো তৃতীয় বিবি। সে ফিরে গেল বলদের ঘরে। শোবার আয়োজন করেও শোয়া হল না। তামাক বাঁধার বাঁশের চটি তুলতে হবে। না হলে মনিব রাগ হবে। তাই অন্দর থেকে একটি টেমি (কুপি) নিয়ে সে কাজে বসে যায়। কাজের শেষে নিজের ঘরে ফিরে এসেও আবার শোওয়া হল না তার। কমরুণকে দেখেনি বলে তার সাথে দেখা করতে সে চলে আসে অন্দরে। কমরুণ তার পুরনো প্রেমিকা। বুধাই রায়ের চালাঘর থেকে বেরিয়ে সেবার সে একদিন শালবনের মধ্যে বেদেদের দেখতে পেল। সেখানেই কমরুণকে দেখেছিল সে। আসফাক লুকিয়ে দেখেছিল অন্যান্য বেদেরা তাঁবু খুলে নিয়ে গেলেও একটি তাঁবু ও একটি মোষ বাঁধা ছিল তখনো। সেই তাঁবুতে কমরুণ বসন্ত রোগে মৃত স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আসফাক ও কমরুণ মৃতদেহকে নদীর চরার গর্তে কবর দিয়েছিল। তারপর দুজনে ফিরে এসেছিল তাঁবুতে। দুজনে বক পুড়িয়ে খেয়েছে। পরদিন সকালে পোশাক ছেড়ে ছোট্ট নদীটিতে স্নানরতা কমরুণকে দেখেছিল সে। সেই তার প্রথম নারী দেহ দর্শন। কমরুণ তাকে ঘুষি মেরেছিল। কিন্তু আসফাকের সাথে কেমন করে যেন তার ভাব হয়ে গিয়েছিল। একদিন তারা জাফরুল্লার খামারে কাজে জুটেছিল। কমরুণ অন্দরের কাজ করত ও সে জমির কাজ। পরে ২৪ ঘন্টাই কমরুণ জাফরুল্লার বাড়িতে কাজ পেল। এক সময় জাফরুল্লা তাকে নিকা করল। যাইহোক জাফরুল্লার বাড়িতে কমরুণের খোঁজে এসে সে তার সাথে কথা বলে এই প্রথম বুঝতে পারল

মুন্নাফ জাফরুল্লার ছেলে নয়, তার নিজের। এজন্যই মুন্নাফ মায়ের নির্দেশমতো তাকে 'মিঞা সাহেব' বলে ডাকে। আসলে বিবিদের নয়, জাফরুল্লার নিজের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষদের দোষ হয় না, দোষ হয় নারীর। তা-ই একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন লেখক।

সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে আসফাক শোবার মাচার উপর খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মুন্নাফের ডাকে তার ঘুম ভাঙে। তারা লরি করে ফিরে এসেছে। জাফরুল্লার কেনা লরি। এবার থেকে গোরুর গাড়ির পরিবর্তে লরিতে করে তামাক শহরে যাবে। মুন্নাফ তার মায়ের কথা মতো তাকে জানায়, "আম্মা বলেছে আব্বা খাওয়া-লওয়া করে না শুলে তুমি বাড়িতে আসবা না।" এই প্রথম মুন্নাফ তাকে 'মিঞা সাহেবে'র পরিবর্তে নাম ধরে ডাকল। একথা জানতে চাইলে সে আসফাককে জানায়, "না। আব্বা বলেছে চাকরকে তা বলা লাগে না।" এসময়ই জাফরুল্লা আসফাককে ডেকে বলদ দূরে নিয়ে যেতে নিষেধ করেন। কারণ আকাশের গতিক ভালো নয়। আসফাক আকাশের দিকে তাকাল। তার মনে হল-- "আকাশে কালো মেঘ নেই। দিনের আলোয় যে আকাশ ঝকঝক করে তাও নয়। এমন নোংরা আকাশ আর কোনোদিনই দেখেনি সে। বলদদের ঘরের মেঝের মতো কাদামাখা যেন। আর রাত্রিতে ঘুম না হলে যেমন হতে পারে তেমন ফ্যাসকা। মোটকথা এমন রং চটা আকাশ সে আর কখনো দেখেনি।"

গল্পের অন্তিমে এই পরিবেশের বর্ণনা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'খাজাঞ্চিবাবু'কে মনে করিয়ে দেয়। গল্পটির অন্তিমে তিনি লিখেছেন, "সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবন্ধ হইল। কিন্তু আকাশ কোথায়! চশমা-আবরিত পরিষ্কার দৃষ্টির সম্মুখেও যে সেখানে শুধু ধোঁয়া, আর ধোঁয়া-- ওই কারখানার চিমনির উদগীর্ণ ধোঁয়ার আড়ালে আকাশ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" গল্পটিতে মানভূমের ফায়ার ব্রিকসের কারখানায় নুতন ম্যানেজারবাবু এসে নতুন নিয়মকানুন, ঠাটবাট চালু করেন। কোম্পানিতে ৪০ বছর চাকরি করা খাজাঞ্চিবাবুর কাজকর্ম নিয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাদের কর্মচারি-বাংলোর ঘরে এসে তর্জন গর্জন করেছেন ঘরের সজ্জারীতি নিয়ে। তাকে চশমা কিনতে বাধ্য করেছেন এবং শেষে চাকরির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। কোম্পানিকে আপন করে নেওয়া খাজাঞ্চিবাবুর পুরনো মূল্যবোধের সাথে আধুনিক সভ্যতার ল এন্ড অর্ডার-এর দ্বন্দ্বের শিকার হতে হয়েছে তাকে। "কারখানায় নূতন আইনের প্রবর্তন ঘটিয়াছে, আসিয়াছে নূতন লোক। যেখানে

আর হয়তো সরল সহজ পবিত্র আন্তরিকতা থাকিবে না-- সে স্থান দখল করিবে অপবিত্র কুটিল হিংস্রতা।"[১০] কারখানার উদগীর্ণ ধোঁয়ার আড়ালে ঢাকা পড়া আকাশ যেন তারই ইঙ্গিত। অমিয়ভূষণ মজুমদারের আলোচ্য গল্পে আসফাক অনেকটা সেরকম ঘটনার শিকার হয়েছে। তার নিজের সন্তান হিসেবে সে যখন মুন্নাফকে জানল তার পরদিনই সন্তান তাকে 'মিঞা সাহেব'-এর পরিবর্তে নাম ধরে ডাকল। এর কারণ জানতে চাইলে সে তার আব্বা (সে যাকে আব্বা বলে চেনে অর্থাৎ জাফরুল্লা) তাকে (অর্থাৎ চাকরকে) এভাবে ডাকতে নিষেধ করেছেন বলে জানায়। আর এই ঘটনা আসফাকের মনের আকাশকে বিবর্ণ করে দেবে-- এটাই তো স্বাভাবিক। লেখক প্রকৃতির বর্ণনা করে আকাশের 'ফ্যাসকা' রংটা তুলে ধরেছেন। একেবারে সার্থক বর্ণনা। খামারে বলদগুলির সাথে থাকতে থাকতে আসফাকও যেন বলদ হয়ে গেছে। তার প্রেমিকা তার নয়, তার সন্তান তার নয়-- তারা যথাক্রমে জাফরুল্লার স্ত্রী ও সন্তান। একটা সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের শিকার সে। যেখানে শোষিতের বা শাসিতের আপন বলে কিছু যেন থাকতে নেই। তার শ্রমও যেন জাফরুল্লার শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে দখলীকৃত। হাকিমও সামন্ততন্ত্রের বশ। নিজের সবকিছু উজাড় করেও সত্য কথা বলতে এবং নিজের হক দাবি করতে হলে ভয়ে থাকতে হয়-- কখন সামন্ততন্ত্রের খাঁড়া নেমে আসে মাথার উপর। নিজে নির্বীর্য হয়েও একের পর এক বিয়ে করতে বাঁধে না সামন্ত প্রভুর। "ফিউডাল সমাজের অনিবার্য পরিণতিতে একদল মানুষ হয়ে যায় মর্ষকামী (mascchist) অন্যরা ধর্ষকামী (sadist)। শ্রেণিচরিত্রের নিদারুণ পরিণতি যথাযথভাবে অমিয়ভূষণের গল্পে উপস্থিত।"[১১] একথা এই গল্পটিতে সমানভাবে প্রযোজ্য।

আসলে পাঠককে কাছে টানার জন্য রোমান্টিক সেন্টিমেন্টাল মোহ সৃষ্টি নয়, এক নির্মোহ জীবন সম্পৃক্ত আবেগ অমিয়ভূষণের লেখায় উপজীব্য হয়েছিল। লেখক হিসেবে পাঠকের কাছে এটুকু দাবি তার ছিল। তিনি গল্পের বিষয়বস্তুর অস্থিমজ্জার ভেতর তার সৃষ্টি প্রতিভাকে প্রোথিত করে দেন, তাই তার বর্ণনায় এক নৈর্ব্যক্তিক কথকের ঢঙ লক্ষ্য করা যায়। তার আঙ্গিকও তাই অন্তর্নির্ঝরণে পরিস্নাত হয়ে এক বিশিষ্ট নিজস্ব ডিকশন লাভ করে।"[১২]

গল্পের এই মূল কাঠামোকে ভিত্তি করে তার লেখা উপন্যাস 'মহিষকুড়ার উপকথা'য় আরো অনেক বিষয় এসেছে। উপন্যাসের শুরুতে সেই বন আছে যেখানে আসফাক কমরুণের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। এই বনের জমিই জাফরুল্লা হাকিমকে দিয়ে

নিজের নামে লিখে নিয়েছিল। সেই বনের বন্য মোষদের যৌনতার ফাঁদে ফেলে ফান্দির পোষ মানানোর কথা আছে। আবার বনে এসে মোষের আস্ফালন এবং আঁ-আঁ-ড় ডাক যেন খামারে ঢুকে থেমে যায়। আসফাকও তেমনি বনে কমরুণের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল তা জাফরুল্লার খামারে এসে ধরে রাখতে পারেনি। জাফরুল্লা তার 'পায়োর' বা পাওয়ারের জোরে কমরুণকে নিজের বিবি করেছেন। এই পায়োরের দ্বারা তিনি শুধু কমরুণ নয় আরও তিনটি বিবি করেছেন। নিজে নির্বীর্য হওয়া সত্ত্বেও তার একাজে কোনো বাধা আসেনি। পায়োরের সাহায্যে তিনি বনের জমিকে নিজের বলে লিখে নিয়েছেন। আসলে সরকারি কর্মী বা অফিসাররা এসে যে তার এখানেই আশ্রয় নেয়। বনের হরিণ অবৈধভাবে শিকার করে সরকারি অতিথিকে সেবা করা হয়। সব পায়োর বা পাওয়ার। "আর কী আজব এই শব্দ! জাফরুল্লার চশমার পায়োর বদলানোর সেই গল্প কে না জানে? ছমির বলে, পায়োর বদলাতে গঞ্জে গিয়েই জাফরুল্লা তিসরা বিবিকে দেখতে পেয়েছিল। জাফরুল্লা নাকি এতদিন বুঝতেই পারেনি, তার বড়ো ও মেজ বিবির বয়স হয়েছে। আবার দেখো জাফরুল্লার সেই বন্দুকের পায়োর। সরু লাঠির মতো কালো চকচকে সেই নলটা থেকে যা বের হয় তা নাকি জমানো জমাট পায়োর, যার একটি ফুলকিতে আকাশে ছোটা হরিণ নিথর হয়ে যায়। ম্যাজিস্টরদের তো বটেই, এমনকি যারা ম্যাজিস্টর নয় অথচ তার মতো পোশাক পরে-- পোশাকের কী পায়োর দেখো। আর দেখো সেই বুনোটা যে দশ বছর আগে একবার এসেছিল তার কী পায়োর, এ অঞ্চলের অনেক মোষ আকারে-প্রকারে অন্য মোষ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে তার পায়োরের ফলে।" কী সহজ-সরল বাস্তবসম্মত উচ্চারণ এরকম একটি জটিল বিষয়ে! পাওয়ার যে কত বড়ো সত্য তা সবাই জানেন। এই পাওয়ার উপন্যাসে জাফরুল্লাকে গ্রাম প্রধান নির্বাচিত করেছে। তার হাতে রাজনৈতিক পাওয়ার এসেছে। উপন্যাসের শেষে ট্রাকের আগমন তো সেই পাওয়ারেরই প্রতীক। শুধু তাই নয়, এতে আদিম কৌম জীবনের সাথে যন্ত্রসভ্যতার দ্বন্দ্ব আছে। "উপন্যাসের শুরুতে যে কালো, বুনো মর্দা মোষের কথা তাকে সমাপ্তিতে জাক্সটাপোজ করা হয় এক কালো প্রকাণ্ড যান্ত্রিক বস্তুর সঙ্গে। লেল্যান্ডের ট্রাক চারদিকে এক মানুষ দেয়াল তোলা। মানুষের কাঁধ সমান উঁচু উঁচু চাকা কুচকুচে কালো রং দেখে আসফাক বলে, বাব্বা ইয়ার সাথত কাউ পারে। সে বলতে চায় এই কলের মোষের সাথে কোনো মোষেরই লড়াই জেতার ক্ষমতা হবে না।আর তখন আমাদের মনে পড়ে আজ শিল্প শুধু আর্ট অর্থে নয়। ইণ্ডাস্ট্রি অর্থেও। ইণ্ডাস্ট্রি শিল্প। সামাজিক-প্রাকৃতিক

ঐতিহ্যের এমন আধুনিক আত্মনির্ণয় {ইণ্ডাস্ট্রি ভার্সাস নেচার—পরিবেশ বিদ্যাও(ecology) যার অন্তর্গত} বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি হয়েছে কি?"[১৩] গল্পে লরির বিস্তৃত বর্ণনা নেই। কেবল মুন্নাফের মুখ দিয়ে লরি কেনার কথা বলা হয়েছে।গোরুর গাড়ির পরিবর্তে তামাক যাবে বলে বলা হয়েছে। অপরদিকে শোষিত, শাসিত, বঞ্চিত আসফাককে উপন্যাসে দেখা যায় মনিবের যৌনতা বাড়ানোর জন্য ঔষধ আনতে সলসলাবাড়ি জনপদে যাওয়ার পথে বনের মধ্যে পাওয়ারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে। খামারে পোষ মানা আসফাক যেন বনের পরিবেশে বন্য মোষদের মতো ডেকে ওঠে। তখন সে মনিবের ওষুধ আনতে দেরি করার সাহস পায় অথচ খামারে এসে মিইয়ে যায়। পাওয়ারের খেলা তো এখানেই। তাই উপন্যাসের অন্তিমে লেখক বলেছেন, "এ তো বোঝাই যাচ্ছে, শহরের রাজারা, যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ না মানা কোনো মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছা মতো বনে চরতে আর কোনদিনই দেবে না। যদিও হঠাৎ তোমার রক্তের মধ্যে এক বুনা বাইসন আঁ-আঁ-ড় করে ডেকে ওঠে।" উপন্যাসটি সম্পর্কে অমিয়ভূষণ গবেষক যথার্থই বলেছেন, "এক বলবান সমাজের কর্তৃত্বের মুঠোর ভেতর সবকিছু চলে যায়। তাই কামরুণ নির্বীর্য জাফরের 'বিবিসাহেবা'। জাফরের প্রভুসুলভ আধিপত্য ও পরাক্রম আসফাককে ক্রমশ নিরক্ত, নির্বীর্য করে চলেছে...। অধিকারবোধ থেকে সরে গিয়ে সে একাকী হয়ে যায়।"[১৪]

উপন্যাসে গল্পের চেয়ে এই পাওয়ারের খেলা অনেক বিস্তৃত এবং বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্্যাস দিনবদলের ছবিকে চোখের সামনে স্পষ্ট তুলে ধরেছে।"অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে-- জমির মালিক জাফরুল্লা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মালিক হচ্ছে-- প্রধান হচ্ছে পঞ্চায়েতে। হরিণ মেরে পার্টি হচ্ছে। পশুর (মোষের) বিকল্পে এসে যাচ্ছে বৃহদাকার ট্রাক। আর শোনা যাচ্ছে আসফাকের 'অ্যা-আঁড়' ক্ষোভ মিশ্রিত যন্ত্রণা। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' 'উপন্যাসেও এই দিনবদলের ইঙ্গিত আমরা পাই। তারাশঙ্করও দেখালেন হাঁসুলি বাঁকের কাহারদের বৃত্তি পরিবর্তন। সমরেশ বসুর 'টানা-পোড়েন' (১৮৮৪)-এও পাই তাঁত শিল্পে নিয়োজিত তাঁতিদের জীবনের দিনবদলকে।"[১৫] গল্পে এই ছবি কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত ও অনেকটাই কথার মারপ্যাঁচে বুঝে নিতে হয়। গল্প ও উপন্যাসের চরিত্র, পরিপার্শ্ব, ঘটনাপ্রবাহ একই আছে। উপন্যাসে জাফরুল্লার বাবা ফয়েজুল্লা, চাউটিয়া ইত্যাদি চরিত্র সংযোজিত হয়েছে। কোচবিহারের রাজার রাজপথে বাইসন মারার কথা এসেছে। প্রকৃতির বর্ণনা ব্যাপকতা লাভ করেছে। লোকভাষা, লোকবিশ্বাস, লোকজীবনের কথা উপন্যাসে এসেছে যা খুবই কম। কিন্তু কাহিনির মূল বক্তব্য গল্প ও উপন্যাসকে একাকার করে দিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে কালোত্তীর্ণ সাহিত্য।

তবে গল্প ও উপন্যাসের দুটি পৃথক ফর্মও তার রচনায় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১/ *মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬ সং, পৃ ১২৪

২/ বন্দোপাধ্যায় শ্রীকুমার-- *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (২০০৬-০৭), মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ ২২

৩/ ঘোষ প্রদ্যোত-- *সাহিত্যের রূপ-রীতি* (২০০৬), অলোকা পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ৩৭

৪/ বসু শুদ্ধসত্ত্ব-- *বাংলা সাহিত্যের নানারূপ* (১৪১০ বঙ্গাব্দ), পৃ ১৪০

৫/ মরণকে শ্যাম সমান মনে করতে গেলে হাসি পায় (অমিয়ভূষণের সাক্ষাৎকার), গ্রহণ করেছেন অনিন্দ্য সৌরভ, *উত্তরাধিকার,* অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন শোণখয়া, ১৯৯৫, সম্পাদক অমিত দাস, রায়গঞ্জ, পৃ ৩৩

৬/ কর্মকার অমরেন্দ্র--উপন্যাসিক অমিয়ভূষণ: স্রষ্টার, সত্তার খোঁজে (প্রবন্ধ), *অমিয়ভূষণের উপন্যাস আলোচনা ও পর্যালোচনা,* সম্পাদনা-- কর্মকার অমরেন্দ্র, ২০১৫, সূর্যাবর্ত, মালদহ, পৃ ২৩

৭/ মজুমদার অমিয়ভূষণ-- *কেন লিখি,* অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড,২০০৫, দে'জ পাবলিশিং

৮/ মজুমদার অমিয়ভূষণ-- *উপন্যাসের গল্প,* প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৯ম খণ্ড, ২০১০, পৃ ৫০৬

৯/ রায় অলোক-- অমিয়ভূষণ: অন্বেষণের গল্প (প্রবন্ধ), *উত্তরাধিকার,* অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, ১৯৯৪, প্রাগুক্ত ,পৃ ১০

১০/ মুখোপাধ্যায় সুবিমল সম্পাদিত গল্প সংকলন *কল্লোল,* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪, ভূমিকা, পৃ ৫

১১/ রাহা সুব্রত-- প্রসঙ্গ অমিয়ভূষণের গল্প (প্রবন্ধ), *উত্তরাধিকার,* অমিয়ভূষণ সংযোজন সংখ্যা, পৃ ৮৫

১২/ প্রাগুক্ত, পৃ ৮১

১৩/ দাশগুপ্ত ধীমান-- ঐতিহ্যের আধুনিক আত্মনির্ণয়: মহিষকুড়ার উপকথা, *অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা,* পৃ ১৪-১৫

১৪/ নাগ রমাপ্রসাদ-- প্রসঙ্গ অমিয়ভূষণ, নিঃসঙ্গ মানুষের পথ চলা এবং একীকরণ (প্রবন্ধ), *বৈতানিক,* অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, সম্পাদক-- গৌতম রায়, শিলিগুড়ি, ২০০১, পৃ ৩৫